অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা নিয়ে দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম শক্তিশালী করার আহ্বান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ আয়োজিত শতবর্ষে 'অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কার বামপন্থি নেতৃবৃন্দ বলেন, অক্টোবর বিপ্লবের অর্জন থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম শক্তিশালী করতে হবে।

বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে ১৯ নভেম্বর '১৭ ঢাকাস্থ বিএমএ মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ভাষাসংগ্রামী ও অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আহমদ রফিক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী কেন্দ্র) এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড যুবরাজ চাউলগাই, শ্রীলঙ্কার জনতা বিমুক্তি প্যারামোনা-জেভিপি (পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট) এর পলিটব্যুরো সদস্য ও ন্যাশনাল অর্গানাইজার কমরেড বিমল নিরোশান রত্নায়েক উরাকুন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) লিবারেশন এর পরিশ্চবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিবাকর ভট্টাচার্য, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি (সেস্টাস) এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, কমিউনিস্ট পার্টি অব ভারত এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বর্নালী মুখার্জী, ভারতের কেরালা রাজ্যের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ডা. প্রসাদ। সেমিনারে সূচনা বক্তব্য পাঠ করেন কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। সেমিনারের কার্যক্রম পরিচালনা করেন কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। সেমিনারে উত্থাপিত বক্তব্য নিচে হলো।

'শতবর্ষে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব : শিক্ষা, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার

কমরেড খালেকুজ্জামান : ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা থেকে আমন্ত্রিত অতিথি কমরেড'স ও বন্ধুগণ।

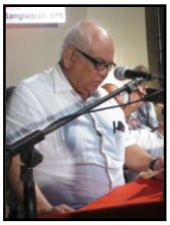

এই সেমিনারে যারা অংশগ্রহণ করেছেন আমার এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানাই।

১৯৯৫ সালে আমরা প্রথমে ইংল্যান্ডে পরে বেলজিয়ামে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সেমিনারে একটা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলাম যে, বর্তমান সময় সর্বহারাশ্রেণির আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রয়োজন নতুন করে দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই শ্লোগান দেই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' এই শ্লোগানের প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল? তার বাস্তবতা কী? বাস্তবতা হলো–অক্টোবর বিপ্লব রূপে (ফর্মে) জাতীয়, মর্মে (কনটেন্টে) আন্তর্জাতিক। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে সর্বহারাশ্রেণির ঐক্য গঠনের লক্ষ্যে মজদুরদের লড়াই যারা পরিচালনা করেন সেই মজদুরদের সংগ্রামী ঐক্য গঠনের লক্ষ্যে, তাদের স্বার্থের স্বপক্ষের দলগুলোর ঐক্য–জাতীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ে ওঠতে হবে। অথচ বর্তমানে বুর্জোয়াশ্রেণি হয়ে আছে আন্তর্জাতিক, শোষিত মানুষ-সর্বহারাশ্রেণি হয়ে গেছে গণ্ডিবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তি, মালিকশ্রেণি বিভিন্নভাবে দেশে দেশে জোটবদ্ধ হয়ে আছে। এই সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষেরও একটা ঐক্য দরকার। সর্বহারাশ্রেণির মধ্যে যদি দেশের মধ্যে ঐক্যসূত্র গড়ে না ওঠে, আন্তর্জাতিকভাবে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ও সংগঠনকে মোকাবেলা করবে কীভাবে?

কার্ল মার্কস দুইটা কাজ করেছিলেন : দল–কমিউনিস্ট লিগ : এর জন্য কমিউনিস্ট মেনুফেস্টো রচনা করেছিলেন এবং একই সাথে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে তুলেছিলেন, বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য এবং এগুলোর মধ্যে একটা সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে। আবার একটা দেশে বিপ্লব করার জন্য একটা দলের রূপরেখা হাজির করেছেন। এখন আন্তর্জাতিক নাই, এটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা দুর্বলতা। যারা এখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে মানেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ চান, তাদের মধ্যে যদি একভাগ ঐক্যও থাকে এটা নিয়েই আমাদের যাত্রা করতে হবে। ৯৯ ভাগ পার্থক্য যদি থাকে, তাকে পাশে রেখে একভাগ ঐক্য নিয়ে আমাদের চলতে হবে, লড়াইয়ে নামতে হবে। আর এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ওই ৯৯ ভাগ অনৈক্য একভাগে নেমে আসবে একভাগ ঐক্য ৯৯ ভাগে উন্নীত হবে। এটা হলো সর্বনিম্ন কর্মসূচি, সর্বোচ্চ বোঝাপড়া। বিতর্কতো থাকতেই পারে, সেটা স্বাভাবিক। কারণ, সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রা একরকম নয়; সর্বহারা-আধাসর্বহারা ও মধ্যবিত্ত, একরকম জীবনযাপন করে না। একধরনের পরিবেশে বড় হয় না; একই ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করে না। একজন দিনমজুর-ক্ষেতমজুরের যে সমস্যা, তার সাথে মাঝারি চাষির সমস্যা মিলবে না। গ্রামের প্রান্তিক কৃষক, দরিদ্র চাষির সমস্যার সাথে কারখানার শ্রমিকের সমস্যা মিলবে না। কিন্তু ওই ক্ষেতমজুর-আধাসর্বহারা, ক্ষুদ্রচাষি এবং মজুর, কর্মচারি এরা সবাই শোষিত, একই শ্রেণিভুক্ত। যদিও তাদের জীবনে সমস্যার অভিজ্ঞতাগুলো ভিন্ন কিন্তু তাদের একটা যোগসূত্র আছে; তারা সবাই মুক্তি চায়। তারা সম্পদ সৃষ্টি করে কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত। এই মানুষগুলোর ঐক্য একদিন একটা ডাক দিলেই হবে না। যারা শ্রমিকদের মধ্যে লড়াই করছেন, কৃষকদের মাঝে সংগঠন করছেন, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের মাঝে যারা আন্দোলন করছেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাথে যে মানুষগুলো যুক্ত আছেন তাদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তা হলো এ ভিন্নতা একই শ্রেণির একই স্বার্থবোধের মধ্যে ভিন্নতার জন্ম হয়। এটা শ্রেণি পার্থক্য নয়; একই শ্রেণির অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব, যা মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে আমাদের মিলনাত্মক ঐক্য সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব। মাও-সে তুং এটাকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–একই শ্রেণির অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পর বিরোধী শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলো ঐতিহ্যগতভাবে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। যেমন : কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (এমএল লিবারেশন), একসময় নকশাল বাড়ি আন্দোলনের সাথে ছিলেন, সেখান থেকে বের হয়ে এসেছেন, এর একটা চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। তারা বলেছেন, তারা একসময় একধরনের আন্দোলন কর্মতৎপরতায় ছিলেন, কিন্তু এখন দায়িত্ব হচ্ছে তার আত্মজিজ্ঞাসা–আত্মমূল্যায়ন এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়া। আমরা এটাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। আমরা তাদের বিষয়গুলো এতো জানতাম না। দিল্লিতে তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলতে গিয়ে অবাক হয়েছি। আমরা শুনিনি যে, এই পার্টি এইভাবে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, এখনও চেষ্টা করছেন, নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধান করছেন। একইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী সেন্টার) : তাদের সংগ্রামে যে ধরনের আত্মত্যাগ, এটা একটা বিরল ইতিহাস। তাদের হাজার হাজার ত্যাগী, নিষ্ঠাবান কর্মী কীভাবে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। রাস্তায় তাদের গুলি করে মেরেছে, ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করেছে। ১০ বছর ধরে তারা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছেন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। পাঁচ হাজার কর্মী এখনও নিখোঁজ। এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারা শত শত বছর ধরে চলা রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা সরকারও গঠন করেছেন, এখন তৃতীয় স্থানে চলে এসেছেন। এখন

তারা মূল্যায়ন করছেন, পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে যদিও তাদের শক্তি কমেছে কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাদের বিপ্লবী চেতনা-প্রেরণা, শক্তি যেন ক্ষয় না হয়। তারা আবার পুনর্গঠিত হচ্ছেন। এগুলো একধরণের শিক্ষা।

তাদের কাছ থেকে যতটুকু জেনেছি, এটা একটা প্রশংসনীয় কাজ। ইউএমএল এর সাথে তাদের একটা বিরোধ আছে। কিন্তু তারা মনে করে, বিরোধ যতই গুরুতর হোক বুর্জোয়াকে পরাস্ত করতে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। অনেক বিষয়ে বিরোধ আছে কিন্তু যত বিরোধই থাক ঐক্য লাগবে।

শ্রীলঙ্কার জেভিপি পার্টির সাথে কথা বলে জানলাম, দুই জন বাদে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব নেতাকে গুলি করে সরকার মেরে ফেলেছে। এখনও তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সব নেতাদের নাম প্রকাশিত নয়। কারণ, আবার যদি আক্রমণ আসে, পার্টির পতাকা ধরবে কে। এই ধরনের লড়াইসংগ্রাম থেকে তারা অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন।

এখানে সবাই কথা বলছেন, আমাদের খোলামন নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমরা এই তিন পার্টির সাথে কথা বলে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমরা তাদের সাথে বলেছি, এই অঞ্চলে আমাদের একটা সংগ্রামের সংহতি গড়ে তোলা দরকার। শাসকশ্রেণি যখন কোন একটা দেশে শ্রমিকশ্রেণির ওপর আক্রমণ করে, এর প্রতিবাদে যদি বিভিন্ন দেশে দেশে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে পারতাম, তা শাসকশ্রেণির মধ্যে একটা চাপ-ভীতি তৈরি করতো তখন আন্দোলনরতশ্রেণি শক্তি-সাহস পেত। তারা এটা স্বীকার করেছেন, অঞ্চলে অঞ্চলে এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ, বুর্জোয়াশ্রেণি এখন অনেকবেশি বর্বর-নিষ্ঠুর ও আক্রমণাত্মক। তারা বিরোধী শক্তিকে দমনে হাত পাকিয়েছে, বিপ্লবী আন্দোলন দমন করা, কমিউনিস্টদের হত্যা, বিভক্তি তৈরি করা, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে ওস্তাদ।

আগে একটা দেশে একজন মালিকের ১টা বা একাধিক কারখানা থাকতো। এখন বহুজাতিক কোম্পানি, একমালিকের অনেক দেশে কারখানা আছে। এক মালিকেরই হয়তো ৩০টা দেশে কারখানা আছে–একটা দেশে যদি শ্রমিকরা আন্দোলন করে, তখন মালিক সে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেশের কারখানাগুলো চালায়। যদি এমন হয়, এই মালিক একটা দেশে কারখানা বন্ধ করলে যত দেশে তার কারখানা আছে তত দেশের শ্রমিকরা একযোগে সংহতি আন্দোলন করছে, তখন মালিক বাধ্য হতো শ্রমিকের দাবি মেনে নিতে। একইভাবে কৃষকদের সংহতি, ছাত্রদের সংহতি, নারীদের সংহতি আন্দোলন লাগবে। ছাত্ররা একটা পয়েন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে যে, সারা পৃথিবীর সমস্ত শিশু বিনাপয়সায় লেখাপড়ার আধিকার পাবে। ছাত্র ফ্রন্টের সম্মেলনে যারা আমেরিকা, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছিলেন, আমরা তাদের এই প্রস্তাব দিয়েছি।

এখন মিলিটারি খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়, যদি এই বাজেট অর্ধেকের কমে নামিয়ে আনা হয়; সারা পৃথিবীর সকল শিশুর থাকা-খাওয়া, শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। মানুষ মারার জন্য টাকা খরচ করা হবে, নাকি মানুষের মতো মানুষ সৃষ্টি ও বাঁচবার জন্য টাকা খরচ করা হবে। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য টাকা খরচ করা হবে নাকি মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য টাকা খরচ করা হবে; বর্বরতা ও লুণ্ঠনে টাকা যাবে না মানবিক একটা সমাজ নির্মাণের জন্য টাকা খরচ হবে। আমরা বলছি, নিস্তরঙ্গ ভালো দিনের চেয়ে, ভালোর প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখা তরঙ্গায়িত দুঃসময় অনেক বেশি সম্ভাবনাময়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র যখন চলছিল তখন মনে হয়েছে সব ঠিকঠাক আছে, এই মনোভাব খুব খারাপ। একটা বিপ্লবী দলের জন্যও তাই। কারণ জগৎটা গতিশীল, একটা মুহূর্তের জন্য দাঁড়াবার সুযোগ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, জগতের যে প্রবাহ, কেহ থামবে না, তুমি একা যদি থাম পিছন থেকে চলমান শক্তি তোমার ওপরে এসে পড়বে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। বিপ্লবী শক্তি একটা চলমান আন্দোলন। যখনই এই আন্দোলনের মধ্যে একটা ঢিলেঢালাভাব আসবে, তখনই সেখানে কিছু সমস্যা ঢুকে পড়বে।

আজকে সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চা, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, আমাদের মধ্যে মতোবিরোধ আছে কিন্তু ঐক্যের জায়গাটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। পার্থক্য যাবে কী করে। আলোচনা করে কিছু প্রশ্নের মীমাংসা হয়, সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। শেষ সঠিকতা মাপার মানদণ্ড হচ্ছে আন্দোলন। লড়াইয়ের পথে নেমেই পথের সন্ধান করতে হয়। লড়াইয়ের বিচারে ঠিক হবে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল। কারণ, শেষ বিচারের রায় দিবে জনগণ। সেই জনগণ থেকে দূরে থেকে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমরা রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে দেখবো ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১২ সাল ৯ বছর তারা বিতর্ক করেছেন আবার প্রতিটা দিনই তারা রাজপথে লড়াই করেছেন।

আমরা চেষ্টা করবো ভারতবর্ষের আজকে যারা এখানে এসেছেন তাদের বাইরেও যারা আছে, শ্রীলঙ্কাতেও আছে, পাকিস্তানে আছে, নেপালে আছে তাদের সাথেও কথা বলার। আমরা তাদের কাছে খোলামেলা একটা আবেদন নিয়ে যাব।

আমরা প্রথমে তাদের বলি, যার যার মত নিয়ে আপনারা আসেন। প্রথমে আমরা খুঁজি আমাদের মধ্যে একটাও ঐক্যের পয়েন্ট আছে কি না। থাকলে আমরা সেটা ধরে এগুবো। ইতিহাসে দেখেন সাম্রাজ্যবাদীরা কতটা বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত ছড়াচ্ছে। তারা রুশ বিপ্লবের সাফল্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে গোলমাল লাগানোর জন্য বলছেন, কার্ল মার্কস ইহুদি, ট্রটস্কি ইহুদি, লেনিনকেও ইহুদি বানিয়ে দিয়েছে এবং বলছে ইহুদি রাজত্ব চলছে। তারাই আবার এখন ইসরাইলের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রচার করেছে যে, রুশ বিপ্লব নাকি 'গডলেস বলশেভিজম' ইত্যাদি।

রুশ বিপ্লবের সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞ বড় মানুষ বিজ্ঞানি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে। বার্নাড শ, চার্লি চ্যাপলিন, রঁমা রঁলা, আইনস্টাইন, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁরা বিপ্লবের প্রশংসা করেছেন, মানুষের প্রতিভার যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছে তাতে অভিভূত হয়েছেন। শিল্পী পল রবসন রাশিয়ায় এসে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন–'এই একটা দেশে এসে আমি বুঝলাম, আমি কালো নই, আমি একজন মানুষ। আগে কোন জায়গায় আমি এটা উপলব্ধি করতে পারিনি। এখানে আমি যখন হাঁটি তখন পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা নিয়ে হাঁটি।' এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে।

এই সেমিনারে বিদেশের ও আমাদের দেশের যারা অংশগ্রহণ করেছেন, এর বাইরে যারা আছে, আমরা তাদের ডাকতে পারি এবং একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। তাতে বের হয়ে আসবে ঐক্যের ও বিরোধের বিষয়গুলো; দেশের অভ্যন্তরের করণীয়, আন্তর্জাতিক পরিসরে করণীয়গুলো। আমরা নিজ দেশে-আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা প্লাটফর্ম গড়ে তুলতে পারি। কারণ, একটা সত্যিকার বিপ্লবী দল লাভবান হয় যদি বামপন্থি আন্দোলন বিকশিত হয় আর একটা বিপ্লবী দল ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি বামপন্থি শক্তি বিকশিত না হয়, দুর্বল হয়। মানুষ দেখছে বুর্জোয়া বনাম বুর্জোয়া—এটা আর চলতে পারে না। দেশের মানুষকে বলতে হবে, বুর্জোয়ারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর বামপন্থিরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সংগ্রাম করছে, তারাই পারবে এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে। একটা দল একা এই দাবি করলে হবে না, সব বামপন্থিরা মিলে এই দাবি করতে হবে। তখন লড়াই চলবে বুর্জোয়া বনাম বামপন্থিদের মধ্যে। সে লড়াইয়ে বামপন্থিদেরই জিততে হবে। বিজয় আমাদের হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

ডা. আহমদ রফিক : এই সেমিনারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া জরুরি। সেমিনার পেপারে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো

এসেছে। রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা কয়েকমাস ধরে অনুষ্ঠানাধি পালন করে আসছি; তা নির্দিষ্ট ছিল অক্টোবর বিপ্লবের মর্মকথা, তার আদর্শ এবং একটা সফল বিপ্লবের প্রেরণা থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করা। বাংলাদেশে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের লড়াই হয়েছে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতিতে প্রাপ্তি খুব একটা

এগোয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গীকার ছিল সমাজতন্ত্র কিন্তু সমাজতন্ত্র দূরে থাক তার কাছাকাছিও আমরা যেতে পারিনি। মধ্যবিত্ত রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সুবিধাভোগী মানসিকতার চর্চা হয়েছে। সমাজ বদলায়নি; ধনবৈষম্য বেড়েছে, শোষণ অব্যাহত আছে। দ্বিদলীয় বুর্জোয়া রাজনীতির শাসনধারার বিপরীতে বামপন্থিরা সঠিক অবস্থান জানান দিয়ে শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারেনি।

মার্কস-এঙ্গেলস এর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, কমরেড লেনিনের হাত ধরে যে বলশেভিক বিপ্লব তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তনের কথা আমরা সবাই মোটামুটিভাবে জানি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রথম বাস্তবায়ন রুশ বিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন হয়েছে কিন্তু আদর্শের পতন হয়নি। শতবর্ষ উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশে যেটা চাচ্ছিলাম–তা হলো বিপ্লবের সফলতা থেকে আমাদের উদ্দীপনা সংগ্রহ করা। যা থেকে আমাদের লক্ষ্য এবং উপায় নির্ধারণ করতে পারি। লক্ষ্য আমাদের সবারই এক কিন্তু উপায় নিয়ে নানা মত-পথ আছে। ফলে এগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে যে বিরোধ তাকে সমন্বয় করতে না পারার কারণে পিছিয়েছি। বর্তমান সময়ে এটা সমন্বয়ের জন্য আমাদের ন্যূনতম কর্মসূচি ও সর্বোচ্চ বোঝাপড়ারভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগুতে হবে। এভাবেই আমরা সফলতা পেতে পারি। বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিতে আমাদের জ্ঞানচর্চা অনেক বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে পাঠাভ্যাসটা কম। এটা না বাড়াতে পারলে নিজের পথ চিহ্নিত করতে পারবে না।

মার্কস-লেনিনের লেখা পড়তে হবে, আয়ত্ব করতে হবে–তারভিত্তিতে পথ চলতে হবে তবেই সফলতা আসবে। ভারতবর্ষের বামপন্থিরা নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা না করে শুধু কংগ্রেসের পিছনে পিছনে ছুটেছে। পরবর্তীতে তো অনেক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মার্কস থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যা ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যেকটি বিষয়কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বিদেশি বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই। তাদের বক্তব্য থেকে আমরা তাদের অবস্থান ও শিক্ষা বুঝতে পেরেছি, যা আমাদের সমৃদ্ধ করবে। আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : বাসদ আয়োজিত এই সেমিনারের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৭ সালে আমি রুশ বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তি

পালন করতে দেখেছি। তখন ছিল আইয়ুব-মোনায়েমের শাসন। জনগণের ওপর চলতো চরম দমন-পীড়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নে সক্রিয় অবস্থায় তখন জয়ন্তি পালিত হয়েছিল; এখন যখন একশ বছর পালন করছি তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে নেই। কিন্তু এর পর যখন দেড় বা দুই শ বছর পালিত হবে, তখন সারা দুনিয়ার মানুষ তা আরও বেশি করে পালন করবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের বিকাশ এমন একটি ব্যাপার যা আকস্মিকভাবে কারও মনোজগৎ থেকে উদ্ভাবিত হয়নি। মানব সমাজের ইতিহাসের ধারায় এর উদ্ভব। এর পেছনে যে বস্তুগত উপাদান এবং ভিত্তি কীভাবে বিরাজ করে তা আমাদের সামনে মার্কস-এঙ্গেলস বিজ্ঞান সম্মতভাবে দেখিয়েছেন। অনেকে আমাদের বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই তোমরা কেন এর জন্য আন্দোলন কর। আমি বলি, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল না তখন কী সমাজতন্ত্রের আন্দোলন ছিল না। অবশ্যই ছিল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন থাকবে কী থাকবে না, সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে দুইটা বড় ঘটনা সাধিত হয়েছিল। একটা হলো পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শোষকশ্রেণিকে উৎখাত করে শোষিতশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা বলতো, শ্রমিক-কৃষকরা অশিক্ষিত কখনও কি তারা দেশ চালাতে পারবে? শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি হিসাবে শুধু তার পার্টির হাতে ক্ষমতা যায়নি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষকের হাতে সরাসরি ক্ষমতা এসেছে। তারা শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি, এর মধ্যদিয়ে সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণের ধারা সূচিত হয়েছিল। আজকে সোভিয়েতের পতনের কারণের সাথে এই দুইটা বিষয় জড়িত। আমরা সেই ভুল-ত্রুটি নিয়ে নির্মোহভাবে আলোচনা করবো। ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মানবজাতিকে যা দিয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। দশটা আলোচনার ভিতরে এই জিনিসটা যেন আমরা ভুলে না যাই। ইতিহাসের এই চর্চা আমাদের সব সময়ে করতে হবে। আমাদের ভুল সংশোধন করা উচিৎ, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ কিন্তু ভুল সংশোধন করতে গিয়ে যদি ভুল হয়, তা হলে সেটা থেকে কোন দিন বের হয়ে আসা যাবে না।

আমরা সাম্যবাদী সভ্যতার জন্য সংগ্রাম করি। মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজের জন্য লড়াই করি। এটা মানব সভ্যতার সামগ্রিক বিষয়। সুতরাং যে বিপ্লব একটা দেশে সূচিত হতে পারে সেই বিপ্লব সেখানে শেষ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো সভ্যতা আমরা সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটাতে না পারি। একটা দেশে বিপ্লব সম্ভব কিনা, না বিশ্বব্যাপী বিপ্লব হবে সেটা নিয়ে একটা বিতর্ক ছিল। যখন জার্মানে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিপ্লব হলো না তখন চিন্তা হলো যে, একটা দেশে বিপ্লব করে সেটা অন্যান্য দেশের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

মার্কসবাদে এই রকম শিক্ষা নেই যে, পুঁজিবাদ থেকে যখন সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটলো সাথে সাথে এর সুফল চলে আসবে। মার্কসবাদ বলে সমাজতন্ত্র হলো সাম্যবাদে যাওয়ার একটা অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়া। এটাকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উৎপাদন সম্পর্ককে বিকশিত করতে হবে। তার মানে এটা একটা জায়গায় স্থির থাকতে পারবে না। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণির হাতে একনায়কত্বের মাধ্যমে ক্ষমতা রাখতে হবে এবং তাকে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর করতে হবে।

১৯৯০ সালে সমাজতন্ত্র একটা পশ্চাদপসারণের হোঁচট খেয়েছে–এখন তার উল্টো শুরু হয়েছে। সে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন পুঁজিবাদের সংকট আরও গভীরতর হয়েছে। এখন তো আর সমাজতন্ত্রকে দায়ী করতে পারবে না। বলতে পারবে না, সমাজতন্ত্রীদের অত্যাচারে তারা সংকটে পড়েছে। বাস্তবে পুঁজিবাদের সংকট তার অভ্যন্তরেই আছে। বর্তমান পুঁজিবাদের দিকে তাকালেই তা দেখা যাবে। এটা পরিষ্কার যে, পুঁজিবাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। পুঁজিবাদকে আক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। পুঁজিবাদ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, নিজে নিজে গিয়ে পড়বে না, তাকে ধাক্কা দিয়ে কবরে ফেলতে হবে। সেটাই সংগ্রাম-বিপ্লব। আমাদের শ্রেণি সংগ্রাম করতে হবে কিন্তু গণসংগ্রামকে অবহেলা করা যাবে না। আমাদের ঐক্যের বিষয়টা এখানে দেখতে হবে, শ্রেণি সংগ্রামের জন্য ঐক্য। আমাদেরকে ৮৬ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে হবে, কলে-কারখানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এইভাবে দেখলে চলবে না যে, রুটি-ভাতের জন্য কমিউনিস্টরা আর ক্ষমতার জন্য আওয়ামী লীগ-বিএনপি–এই কাহিনি শেষ হয়ে গেছে। আমরা কমিউনিস্টরা আর সেই ভুল করবো না। আমরা সতরঞ্জি বিছাবো আর বুর্জোয়ারা বক্তৃতা করবে সেই পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের ফসল আমাদের ঘরে তুলতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নকে আমাদের আন্দোলনের সাথে মিলাতে হবে। আমাদের বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে হবে। আমরা যে শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছি তাকে আরও কার্যকর করতে হবে। ঐক্য শুধু দেশের মধ্যে হলে হবে না, বিভিন্ন দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর মধ্যেও ঐক্য হতে হবে। শত্রুরা যখন তাদের শোষণ-লুটপাটের জন্য তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুনিয়াব্যাপী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে–আমরা কেন হব না। সেটা করতে গেলে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মতো, যেখান থেকে অর্ডার আসবে, তা নয়। আজকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ, আমরা যোগাযোগ করে ১৫০টা পার্টি ঠিক করলাম, একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করলাম, সিরিয়ার ঘটনার ব্যাপারে আমরা একসাথে প্রতিবাদ করবো। অথবা অন্য কোন ইস্যুতে আমরা একসাথে প্রতিবাদ করবো। আমরা অনুরোধ করবো কোন পার্টি তার আন্তর্জাতিক কর্তব্যটাকে যেন গুরুত্বহীন করে না দেখে। ২০২১ আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হবে। স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা একমাত্র পূরণ করতে পারে বামপন্থিরা। তাই জনগণের প্রতি আহ্বান তাদের ক্ষমতায় আনেন।

কমরেড যুবরাজ চাউলগাই : অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বপ্যাপী গুরুত্ব এবং নেপালে তার প্রভাব

মানবসভ্যতায় সামন্ত প্রথা উত্থানের পর থেকে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অংশ তথা মেহনতি মানুষ একইভাবে শোষিত হয়ে আসছে। দাস এবং মেহনতি মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। স্পার্টাকাসের অনুপ্রেরণায় দাসরা বিদ্রোহ ও আন্দোলন শুরু করেছিল। স্পার্টাকাসের অনুপ্রেরণায় সংঘটিত দাস বিদ্রোহ প্রাচীন ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী আন্দোলন। কার্ল মার্কস স্পার্টাকাসকে প্রাচীন কালের সর্বহারাদের সত্যিকারের প্রতিনিধি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে দাস বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। নবউত্থিত শোষকেরা পুরাতন প্রতিষ্ঠিত শাসকদের স্থান দখল করে। সে জন্য তারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দাসব্যবস্থার অনুরূপ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে। যা উৎপীড়িত মানুষের মাঝে সামান্যতম মুক্তির আশার আলো সৃষ্টি করতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, গভীর বিশ্বাস ও চূড়ান্ত আশাবাদ বিপ্লবের তরীকে প্রত্যাশার সাগরে ভাসাতে পারে।

প্যারি কমিউন ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে এই ৭২ দিন টিকে ছিল। প্যারি কমিউন সমগ্র বিশ্বে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে, সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে উৎপীড়িত জনগোষ্ঠী মুক্তির পথ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু দক্ষ নেতৃত্ব ও যথাযথ সংগঠনের অভাবে প্যারি কমিউন অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। মাত্র ৭২ দিনের মাথায় প্যারি কমিউনের অবসান ঘটে। তারপর প্রতিক্রিয়াশীল শাসক হাজার হাজার কমিউনারদের হত্যা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মেহনতি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

প্যারি কমিউনের বিপর্যয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে কমরেড লেনিনের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। জনগণ সচেতন হয়। বিশ্বব্যাপী সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে শোষণ ও দাসত্বমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এমন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ইশতেহার ঘোষণার ৭০ বছর পর অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কমিউনিস্ট ইশতেহারের সফল পরিণতি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক শক্তি অর্জন নির্ভুল কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নির্ভর করে। মেহনতি মানুষের সংখ্যাধিক্যই শুধু শেষ কথা নয়। মেহনতি মানুষের জয়ের জন্য সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পুঁজিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প নেই।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য শুধু রুশ জনগণের মুক্তির স্বাদ আনয়ন করেনি। এর বড় তাৎপর্যময় দিকটি হলো, বিশ্বের দেশে দেশে মেহনতি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। এক দশকের মধ্যে রাশিয়া থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে অবসান হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সমানাধিকার, নারীর ভোটাধিকার, সমমজুরির বিধানও বাস্তবায়ন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের সর্ব প্রথম রাষ্ট্র যেখানে সকল নাগরিকের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং রাষ্ট্র উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথা চালু করে। গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে দাবিদার ইংল্যান্ড নারীর ভোটাধিকার রুশ বিপ্লবের ১০ বছর পর চালু করে। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ Angus Moddison এর মতে ১৯৬৫ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিকাশমান ছিল। তারা জাপানসহ অনেক উন্নত রাষ্ট্রের চেয়ে অধিকগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। কাজেই অক্টোবর বিপ্লব বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বময় প্রভাব বিস্তার করে।

অক্টোবর বিপ্লব জনগণের মুক্তির জন্য সোভিয়েত বলয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা সোভিয়েতের স্থল-জল সীমা অতিক্রম করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করে। ফলে, ওই দেশগুলোর অভ্যুত্থান শাসকশ্রেণির উপর আকস্মিক আঘাত হিসাবে দেখা দেয়। দেশে দেশে একই নামে বা ভিন্ন নামে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মান এবং জাপানেও সৃষ্টি হয়। বিলম্বে হলেও ইরাক, ইরান এবং সৌদিআরবের মতো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।

কিছু আদর্শগত বিবেচনা :

অক্টোবর বিপ্লব মার্কসবাদের প্রথম সফল প্রয়োগ। এই বিপ্লব মার্কসবাদের আদর্শ ও অনুশীলনের সফল সমন্বয়। বিপ্লবের ভিন্নতা নিয়ে অনেক মতাদর্শিক এবং বিশ্লেষণগত বিতর্ক আছে। তার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে মূল্যায়ন করলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যাবে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পতাকা দেশে দেশে উত্তোলিত হবে।

সমাজতন্ত্র জনগণের গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র

অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে লেনিন জনগণের এককেন্দ্রীকতার (People's centerlism) জন্য জীবন্ত বা সজীব নীতিমালার বিকাশ আনয়ন করেন। সেই নীতিমালা ছিল মার্কসের প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। তার মূল বক্তব্য ছিল, 'সর্বহারার গণতন্ত্রের নব উচ্চ রূপ প্রদানের মাধ্যমে সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব শক্তিশালী হতে পারে।' লেনিন স্পষ্ট ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, সমালোচনার স্বাধীনতা, কর্মধারার সমতা হচ্ছে জনগণের একেন্দ্রীকতার (People's centerlism) সারবস্তু।

লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখালেন যে, প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে একদিনে উচ্ছেদ না করে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাকে উন্নত রূপ দান করে সর্বহারার গণতন্ত্র প্রচলন করা সম্ভব। তিনি মতামত দিলেন যে, সমালোচনার স্বাধীনতা এবং কর্মধারার সমতা ছাড়া জনগণের এককেন্দ্রীকতা নিশ্চিত হতে পারে না।

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বেই জনগণের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই পরিষ্কার পর্যবেক্ষণ উপলব্ধি করে লেনিন একটি শ্লোগান তুলে ধরেন–'সোভিয়েতকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান কর'। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরে লেনিনের জনগণের এককেন্দ্রীকতার উন্নততর নব নব নীতিমালার চর্চা ও অনুশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধাসমূহের অবসান ঘটে। এই নীতিমালা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্ম দেয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারণার বিপরীতে সর্বহারার এককেন্দ্রীকতা বিস্তার সাধনের বাধা কমতে থাকে। একই সময় প্রচলিত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্যের মৌলিক নীতিমালা সামনে চলে আসে। জনগণের এককেন্দ্রীকতা সম্বন্ধে রোজা লুক্সেমবার্গের প্রবন্ধের প্রতিফলন সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি বলেন, 'দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং বাক-পত্রিকা ও সংগঠনের স্বাধীনতা ব্যতীত মেহনতিশ্রেণির পক্ষে শাসনব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। তা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের ক্রান্তিকালীন অবস্থায় (অনিবার্যভাবে প্রকাশিত) হাজার হাজার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ বিষয়ে লেনিন বলতেন, যদি আমরা সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে না পারি, তা হলে রাশিয়ার জনগণ সঙ্গত কারণেই আমাদের শক্ত রশিতে ফাঁসি দেবে। লেনিনের এই বক্তব্যেই প্রকাশ পায় যে, তিনি জীবনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিষ্কারভাবে ক্ষুব্ধ ও বেদনাবোধ নিয়ে সোভিয়েত শাসনে আমলাতন্ত্রের অপরিসীম ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করেছিলেন। লেনিনের এই সতর্কতা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষতিকর অবস্থা সৃষ্টিতে আমলাদের ভূমিকার ওপর উদ্বিগ্নতার প্রকাশ। তিনি আমলাতন্ত্রের উচ্ছেদের মাধ্যমে সর্বহারা গণতন্ত্র বাস্তবায়নেও সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। সে যাই হোক, স্বাস্থ্যগত অবনতির কারণে তিনি পার্টি ও সরকার সম্বন্ধে নতুন সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ছিলেন না। তিনি সোভিয়েতে তার উদ্যোগ ও পরিকল্পনা পুরাপুরি প্রয়োগ করে যেতে পারেননি।

কমরেড স্তালিনের মূল্যায়ন :

মহামতি লেনিনের মৃত্যুর পর রুশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব কমরেড স্তালিনের ওপর অর্পিত হয়। কমরেড স্তালিন তার যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো : লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা, সুবিধাবাদকে পরাস্ত করা, যৌথখামার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে সোভিয়েতকে শক্তিশালী করা, হিটলারের ফ্যাসিবাদ পরাস্ত করা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাসমূহকে একক অভিজ্ঞতায় রূপদান ইত্যাদি। তিনি ৩০ বছর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

প্রভূত অবদান থাকা সত্ত্বেও তাঁর দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। যে বিষয়গুলো মূল্যায়ন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে উপলব্ধিতে এনে প্রয়োগ করা, জনগণের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা এবং রাজনৈতিকভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা ও সমাজতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্ক। নিশ্চিতভাবে কমরেড স্তালিনের প্রারম্ভিক বিষয়গুলোর এবং তাকে মূল্যায়ন করতে কমরেড মাও সে-তুং এর মূল্যায়নকে ভিত্তি ধরে এগুতে হবে।

মাও সে-তুং এর নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ অর্থেই বলেছেন, 'The question of Stalin is of worldwide importance, and effect of which is wide spread in all the countries and classes and is freely being debated even today and on which different class and their political parties have dioffering views. There is a great possibility that there will be no conclusion on this question even during this entire millennium'

নেপালের কমিউনিস্ট আন্দোলন :

নেপালের রাজনীতিতে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব ও উদ্দীপনা দীর্ঘস্থায়ী। অক্টোবর বিপ্লবের ঢেউ বিশ্বব্যাপী স্বৈরতন্ত্র, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে। নেপাল এই বিপ্লবের ঢেউ থেকে দূরে থাকতে পারেনি। ১৯৪৯ সনের ২২ এপ্রিল কমরেড পুষ্প লালের নেতৃত্বে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তখন রাজা রানার শাসন চলছিল, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি রাজার সর্বময় ক্ষমতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। পার্টি গঠনের পর থেকেই সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতাদর্শ গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল নেপালি কংগ্রেস পার্টি এবং তাবেদার রাজার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করে। রাজা জনগণের আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনীকে ব্যবহার করে। এই পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লবীরা নেপালের সমতল এলাকার পশ্চিমাংশে (Bhairahwa) বাহিরা নামক স্থানে সমবেত হয়। রাজা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদের নিষ্ঠুরভাব দমন করে। কমরেড ভীম দত্ত পান্টের নেতৃত্বে ১৯৫২-৫৩ সালে সমতল ভূমির পশ্চিমভাগে সামন্তবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবীরা সংগঠিত হতে থাকে। সেখানে নৃশংসভাবে তাদের দমন করা হয়। নেপাল সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী কমরেড ভীম দত্তের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে দেশের জনগণের শাসন কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন পরিপক্কতা অর্জন করতে থাকে। বিদ্রোহীরা সামন্ত প্রশাসন অমান্য করতে থাকে, জমিদারের মুচলেকাপত্র ধ্বংস করে, তাদের ফসলের ভাণ্ডার ধ্বংস করে। তারা বিদ্রোহে মেতে ওঠে। কিন্তু পার্টির এক নেতা Keshar Jung Ragamajhi লজ্জাকরভাবে রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই লজ্জাজনক ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘস্থায়ীভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে দেখা দেয়।

১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর রাজা সরাসরি দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তিনি শাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতী আইন চালু করেন। কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন পার্টি গোপন অবস্থান গ্রহণ করে। সে সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে অনেক ক্ষুদ্র সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। তারা গোপন অবস্থায় সংগঠিত ও প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাদের প্রস্তুতির উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দেশে নতুন রাজনৈতিক প্রথা চালু করা। কমরেড প্রচন্ড তখন নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। তিনি বহুবার আলোচনা করে একক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা করেন। পরিশেষে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিটি সেন্টার) নামে সংগঠন দাঁড় করাতে সক্ষম হন । ১৯৯৬ সালে জনযুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদী নামে পরিনত হয়।

কমরেড প্রচন্ডের নেতৃত্বাধীন নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) ১০ বছরের বেশি সময় ধরে নেপালে জনযুদ্ধ পরিচালনা করে। এই যুদ্ধে ১৩ হাজার কর্মী (ক্যাডার) নিহত হয়, ৫ হাজারের বেশি নিখোঁজ, হাজার হাজার কর্মী আহত। ৩২ হাজার সদস্যের পিএলএ (PLA) গঠন করা হয়। তারা নেপালের ৮০ শতাংশের বেশি এলাকা দখল করে এবং জনগণের সরকার (People's Government) ও জনগণের আদালত (People's Court) প্রতিষ্ঠা করে। জনযুদ্ধে মহিলা, দলিত জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ৮০% এলাকা দখলের পরও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল হয়নি। নেপালের সামন্ত সরকার রয়েল নেপাল আর্মি (Royal Nepal Army) ব্যবহার করে। রয়েল নেপাল আর্মি যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সমর্থনে বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। পাঁচ বছর যাবৎ যুদ্ধ করে তারা পরাস্ত হয়, নতুন রাজনৈতিক ধারার সূচনা হয়। বিপ্লবী শক্তি নেপালের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে।

জনযুদ্ধের সময়ে প্রথম পাঁচ বছর পার্টি গ্রাম ও ক্ষুদ্র নগর দখল করার পর রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করে ধীরে ধীরে চীনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় মেয়াদের পাঁচ বছরের জন্য চীন ও রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর প্রক্রিয়ায় মিলন ঘটানোর চেষ্টা করে। জনযুদ্ধকালীন পার্টির জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র ছিল মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শক্তির দুই প্রধান স্তম্ভ। ওই সময়ে তারা জনগণের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। পার্টি তখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কৌশল অবলম্বন করে। যুগপৎভাবে গণতন্ত্রের বাকি কাজগুলো সমাধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মাওবাদী বিপ্লবীগণ এবং পার্লমেন্টারি ধারার ৭টি দল অসাংবিধানিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন অবসান কল্পে আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একমত হলো। তখন হাজার হাজার মানুষ কাঠমুন্ডুর রাস্তায় নেমে পড়ে। রাজশক্তি কর্তৃক দৃবৃত্ত বলে আখ্যায়িত মাওবাদীরা জনতার ঢলে সামিল হয়। মানুষ রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন, আইন সভার নির্বাচন, সেক্যুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রভুত দাবি উত্থাপন করে। রাজা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং পুরাতন সংবিধান বাতিল করে অন্তবর্তীকালীন অধ্যাদেশ জারি করে এবং ২০০৮ সালে আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মাওবাদীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সর্ববৃহৎ পার্টির মর্যাদা অর্জন করে। চেয়াম্যান প্রচন্ড নেপাল প্রজাতন্ত্রের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। দুঃখের বিষয়, কাঠামোগত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইনসভা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে আইনসভা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় বারের মতো আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মাওবাদীরা পূর্বের নির্বাচনের তুলনায় কম আসনে জয়লাভ করে। তখন অপরাপর পার্টিগুলোর সাথে মতৈক্যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।

নেপালের নতুন সংবিধান খুব উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এখানে প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফেডারেল ব্যবস্থা, সেক্যুলারধারা, সর্বজনীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার স্থান পেয়েছে। এটা নেপালের জনগণের দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে মহৎ অর্জন। সময়ের প্রয়োজনে আগামীতে সংবিধানের ছোটখাট পরিবর্তন বা সংশোধনী স্বাভাবিক ব্যাপার।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী কেন্দ্র) এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউএমএল) অপর কয়েকটি বাম সংগঠন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই পার্টিগুলো ঐক্যের কথা ঘোষণা দিয়েছে। জনগণ প্রত্যাশা করে যে, একীভূত কমিউনিস্ট পার্টির সরকার সমাজতান্ত্রিক নেপালের মৌলিকভিত্তি তৈরি করবে। কমিউনিস্টদের সমঝোতার কৌশল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

কমরেড দিবাকর ভট্টাচার্য : এই বাংলাদেশ যেখানে ধর্মকে ছাপিয়ে ভাষা আন্দোলন একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। রুশ বিপ্লবের এক শ বছরের

ইতিহাস, ২৬ বছর আগে যার বিপর্যয় ঘটেছে, তার চর্চা কেন করছি। ইতিহাস চর্চার জন্য বাসদ দলের নেতারা আমাদের এবং আপনাদের ডেকে আনেনি। এক শ বছর আগে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল যা এখনও জীবন্ত, এখনও প্রাসঙ্গিক। রুশ বিপ্লব গোটা পৃথিবীতে একটা ভূমিকম্পের মতো হয়েছিল। এই যুগকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অনেক বড় মানুষরাও অনেক কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নব যুগের উষাসম প্রভাতী তারা। সে জানান দিচ্ছে যে, রাত শেষ হয়ে আসছে ভোর হতে দেরি নেই। ১৭০ বছর আগে কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনা করা হয়েছিল। সেই ইশতেহারে বলা হয়েছিল, একটা ভূত, গোটা ইউরোপকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে–সেটা হলো কমিউনিজমের ভূত। দেড় শ বছর আগে লেখা কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল, যেখানে দেখানো হয়েছিল, আমরা যে কাজ করি, সেখান থেকে কীভাবে শ্রম চুরি হয়, কীভাবে মূল্য তৈরি হয়, উদ্বৃত্তমূল্য কীভাবে হয়, কীভাবে মুনাফা হয়। এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিল রাশিয়া, কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে। যেমন, প্যারি কমিউন ১৮৭১ সালে হয়েছিল কিন্তু টিকে থাকতে পারেনি। তার কী ব্যর্থতা ছিল সেটার শিক্ষা রাশিয়া নিয়েছিল। সে শিক্ষা নিয়ে কী রাশিয়া টিকতে পারলো? ফলে আমাদের শিক্ষা কোথায়? রুশ বিপ্লব যেমন শিক্ষা তেমনি তার ব্যর্থতাও শিক্ষা। আজকে ফ্যাসিবাদকে আটকানোর ক্ষেত্রে রাশিয়ার অবদানকে অনেকে স্বীকার করে না। যে আমেরিকা আজকে দাদাগিরি করে তাকে খুঁজেই পাওয়া যেত না, যদি রাশিয়া ফ্যাসিবাদকে রুখে না দিত। আজকে আমেরিকার ঋণ থাকা উচিৎ রাশিয়ার বিপ্লবের কাছে। আজকের দিনেও যদি ফ্যাসিবাদকে রুখতে হয়, তা হলে অবশ্যই দরকার কমিউনিস্টদের। দেশে দেশে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো লড়ছে, ফ্যাসিবাদকে রুখতে তাদের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন অন্যান্য শক্তি। শুধু ফ্যাসিবাদ নয় পুঁজিবাদের তাণ্ডবও রুখবে কমিউনিস্টরা, তাদের দিকে তাকিয়ে আছে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। আজকে যদি ট্রাম্পের মতো দানবকে রুখতে হয়, মোদিকে মোকাবেলা করতে হয়, তা হলে লাগবে কমিউনিস্টদের। মোদি যদি সেক্যুলার ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করে, সংখ্যালঘু মানুষের ওপর হামলা চালায়, স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ পড়বে। ফলে, বিশ্বের দেশে দেশে মানবতার সকল শত্রুকে মোকাবেলা করতে হবে কমিউনিস্টদের।

বাংলাদেশে অনেক লড়াইয়ের ইতিহাস আছে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস। এখানে বাংলাদেশের সকল বামপন্থিরা একসাথে বসে আছেন, যারা লড়াইয়ের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। আমি বলবো, সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া ও সমগ্র পৃথিবীর লুটেরাগোষ্ঠী-ফ্যাসিস্টরা আজকে ভয় পাচ্ছে কমিউনিস্টদের। আমি শেষে বলব শ্রমিকশ্রেণি একদিন শৃঙ্খল মুক্ত হবে। কারণ শ্রমিকশ্রেণির কাছে শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছুই নাই, জয় করবার জন্য আছে গোটা দুনিয়া। সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন।

অশোক মুখোপাধ্যায় : রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করার জন্য বাসদকে

সেন্টাস এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে–তখন ভিয়েতনাম নিয়ে উন্মাদনা। তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম। ১৯৭০ সালে লেনিনের জন্ম শতবার্ষিকীর সময়, কমরেড লেনিনের আহ্বান ভেতরে একটা উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের চোখের সামনে যুদ্ধ, কানের সামনে গোলাগুলির আওয়াজ, সেটা ছিল একটা প্রেরণা। আমরা সেটা দেখার জন্য এসেছিলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলেছিলাম। পরে দেখলাম সে বিপ্লবের চেতনা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। '৯০ এর দশকে সোভিয়েত রাশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। চীনের দেং শিয়াও পেং ঘোষণা করলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব ভুল ছিল। গর্বের ভিয়েতনাম বাজার অর্থনীতির কথা বলছে। আজকে আমাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে হচ্ছে।

আমরা এখন ২০১৭ সালে এসে ১৯১৭ সালকে স্মরণ করছি। এর মধ্যেদিয়ে আমাদের মধ্যে বিপ্লবের যে প্রেরণা, শিক্ষা, তাৎপর্য তাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা সংগ্রাম। বিপ্লবী সংগ্রাম–অন্য সকল সংগ্রামের মতো তার জয়পরাজয় আছে এবং পরাজয় হয়তো বেশি। ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন কি ব্যর্থ হয়েছিল–আসলে ব্যর্থ হয়নি। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ হয়েছিল–আসলে ব্যর্থ হয়নি। লেনিন বললেন, এটা বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সেল। আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় দেখি তিনি বিভিন্ন ছক সাজাচ্ছেন, পার্টিকে তৈরি করছেন, কর্মীদেরকে উদ্দীপ্ত করছেন, শ্রমিকশ্রেণিকে শিক্ষিত করছেন। যখন যুদ্ধ লাগছে তখন নিজ দেশের ও অন্য দেশের কমরেডদের বলছেন, তৈরি হও। তিনি থিসিস লিখছেন। বলছেন, সাম্রাজ্যবাদকে তার দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে হবে। পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ শোষণ করছে। মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে–সেখানে আঘাত করতে হবে। তিনি যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তা দেখা যায় ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া বিপ্লবের কয়েক মাসের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেল, শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতায় চলে এলো।

রুশ বিপ্লব ইতিহাসের একটা বিরাট ঘটনা। তার আগে সারা দুনিয়ার কাছে আলোচ্য বিষয় ছিল ফরাসি বিপ্লব। এখন কেউ ফরাসি বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করে না। রুশ বিপ্লব নিয়ে মানুষ উদ্দীপ্ত, সারা পৃথিবীর মানুষ তা নিয়ে আলোচনা করছে। সেই বিপ্লব মানুষকে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। তার ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদ–সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজকে মানুষের মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি করছে, শোষণ করছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ আজকে জাগ্রত হতে চাইছে। আজকের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে–বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মানুষের ক্ষোভ আছে। আমেরিকা যেমন সারাবিশ্বে দাদাগিরি করে বেড়ায়, আমাদের দেশের সরকারও এইসব অঞ্চলে দাদাগিরি করার চেষ্টা করে। তার বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছে। এখন মানুষ তাকিয়ে আছে রাশিয়ার দিকে, লেনিনের দিকে। রুশ বিপ্লব এক দিকে এনে দিয়েছে মুক্তির আস্বাদ, অন্য দিকে সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, স্থাপত্যে, সিনেমায়, নাটকে পৃথিবীতে পরিবর্তনের ঝড় তুলে দিয়েছিল। একথা ঠিক, সেখানে কিছু ভুলও হয়েছিল। ভুলগুলো কী এবং কার, তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। একারণে নয় যে, আমরা ভুল দেখিয়ে তৃপ্তি পাব। ভুলের মূল্যায়ন এজন্য চাই, কাউকে ছোট করার জন্য নয়, ভুলকে সমালোচনা করার জন্য নয়, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তা শোধরানোর জন্য মূল্যায়ন করবো। আমরা আজকে যখন রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করবো, তার যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে, তার থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আলোচনা করবো। যাতে আগামী দিনে যারা লড়বে, এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তারা যাতে এই ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে, জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে, মুক্তির সংগ্রামটা করতে পারে। রুশ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল মার্কস-এঙ্গেলস থেকে শুরু করে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে লেনিন পর্যন্ত এসে, সামগ্রিক একটা জ্ঞানভাণ্ডার তার হাতিয়ার ছিল বলে। এই জ্ঞানভাণ্ডার তার সবচেয়ে বড় শক্তি, তাকে পথ দেখিয়েছে। পরবর্তীতে এই জ্ঞানভাণ্ডারকে আমরা উপেক্ষা করেছি, তার থেকে খানিকটা সরে এসেছি। আমরা ভেবেছি আমরা যদি হাতে-কলমে কাজ করতে পারি, আমরা যদি শ্লোগান দেই, আমরা যদি কারখানায় কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি, আমরা যদি চাষিদের নিয়ে লড়াই করতে পারি–তাতে করে আমরা দুটা জিনিস জানলাম কিনা, তাতে কিছু যায় আসে না। হ্যাঁ, এটা ঠিক, তখন কিছু যায় আসবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে যায়, আসবে। পাঁচ বছরে যায় আসবে না, ৩০ বছরে যায় আসবে। আমরা না জানার ফলে যে ছোট একটা ভুল করে গেলাম, এই ভুলটা

কালক্রমে অনেক বড় একটা ফাটল সৃষ্টি করবে। ফলে আজকে আমাদের এটা ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে যেয়ে, এই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে গিয়ে, আমরা আমাদের বিপ্লবী জ্ঞানভাণ্ডারকে বিকশিত করে এগুতে পারছি কিনা, নানা সমস্যার আমরা সমাধান করতে পারছি কিনা। এভাবে যদি আমরা করতে পারি, তা হলে আজ থেকে একশ বছরের আগেকার যে ঘটনা, সে ঘটনার ভালো-মন্দ থেকে শিক্ষা নিয়ে এগুতে পারবো। এর ভালো দিকটাই একটা শক্তি, সম্পদ। এ শক্তি যদি আমরা আয়ত্ব করতে পারি তা হলে একে রুখবার শক্তি কারও থাকবে না।

আজকে শুধু বাংলাদেশ নয়–ভারতবর্ষ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মধ্যে যদি একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে, সে একটা বিরাট শক্তি। একই সঙ্গে যদি এই সমস্ত দেশগুলোর মুক্তি সংগ্রাম মিলিয়ে নিতে পারে, তবে আমাদের বিজয় আসবে। আমরা বিভিন্ন দেশের শোষিত মানুষের ঐক্য ধরে রাখবো। এই সমস্ত দেশে যখন সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা তুলে, মানুষের ঐক্যকে বিভক্ত করতে চায়, যখন বিভিন্ন দেশের শাসকেরা জাতীয়তাবাদের নামে, ঐক্যকে ফাটল ধরাতে চায়, আমরা তাকে রুখে দিতে পারবো।' শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য' শ্লোগানকে সামনে রেখে, আমরা এগুনোর চেষ্টা করবো। সারা দুনিয়ার পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-মৌলবাদ ঐক্যবদ্ধ, তাদের কোন শ্লোগান লাগেনি, সারা পৃথিবীর মানুষকে নিঃস্ব করতে তাদের কোন অসুবিধা নেই। সুন্দরবন ধ্বংসে যখন রামপালে পুঁজি বিনিয়োগ করে, তখন কিন্তু ভারতবর্ষ দেখে না, তাতে বাংলাদেশ-ভারতের কী ক্ষতি হবে। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমরা জানি আজকে যদি সুন্দরবনের বাঘের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, চিলকা হ্রদে ডলফিনের অবাধ বিচরণের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এর প্রভাব পড়বে বিশ্বজুড়ে। ফলে, এগুলো নিয়ে লড়াই কোন বিচ্ছিন্ন লড়াই নয়। যেমন একদিকে রুটি-রুজির লড়াই, একদিকে চাকরি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, চিকিৎসার লড়াই, তেমনি প্রকৃতি-পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ এর লড়াই–স্বভাবতই তা একদিকে জাতীয় অন্যদিকে আন্তর্জাতিক। কারণ আবহাওয়া, অক্সিজেন, আকাশ, নদী-পানি, বন এগুলোর তো কোন কাটাতারের বেড়া নেই। চেষ্টা করেও তাকে বেড়া দিয়ে আটকানো যায় না। শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের আন্দোলনকেও কাটাতার দিয়ে আটকানো যাবে না।

কমরেড বিমল নিরোশান রত্নায়েক উরাকুন —

জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এবং অক্টোবর বিপ্লব : অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীতে বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ, যার মধ্যদিয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। (যদিও ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়ে টিকে ছিল মাত্র ৭২ দিন।) কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি মহান অক্টোবর বিপ্লব যে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' সৃষ্টি করেছিল তা এখন নেই। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব যে ভাবাদর্শ সৃষ্টি করেছিল তা এখনও অক্ষুণ্ন ও অম্লান। এই বিপ্লবের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও আদর্শ পৃথিবীতে মহামূল্য বহন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে সৃষ্টি হলো, আবার কীভাবে এর অবসান হলো সে বিষয়ে গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্রপরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। আমরা এবং আমাদের দেশ শ্রীলঙ্কাও রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি।

শ্রীলঙ্কা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। এদেশের বয়স্ক মানুষেরা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সুখকর স্মৃতি বহন করে। এক সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের দেশের উন্নত সমাজের জন্য সবচেয়ে নিকটতম হিতাকাঙ্ক্ষী ও অপরিসীম নিয়ামক হিসাবে ভূমিকা রেখেছে।

সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা :

পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কা–নব্যউপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াইয়ের প্রেরণা ও উদ্দীপনার আধার ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিস্তারসাধন এবং নিপীড়িত জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করা এবং বিপ্লব সংঘটিত করায় সেভিয়েত ছিল আদর্শ। উৎপীড়িত-নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সেভিয়েত ইউনিয়নকে আমরা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে, বৈষম্য কমাতে, শিল্পায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রধান করা, বাসস্থান ও পরিবহনের সমস্যা সমাধানে–সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল প্রেরণা।

সমাজতন্ত্র কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, এটা ইতিহাসের ধারাবাহিক বিকাশের স্তর; এই সত্য প্রমাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল আদর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং তার প্রকৃতি হুবহু অনুসরণ না করে রাজনৈতিক শিক্ষা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হতো। আমাদের দেশে কিছু ব্যক্তি ছিল যারা অক্টোবর বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি হুবহু অবস্থায় প্রয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন। বিপ্লবের কৌশল সম্পর্কিত এমন ধারনা ছিল ক্ষতিকর।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে আমাদের দেশে অনেক সত্যিকারের ত্যাগী বামপন্থি ছিলেন। তারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। আবার এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যারা তাদের অস্তিত্বের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দেয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতো আর পুঁজিবাদের সেবা করতেন। তথাপি যারা নানা বিবেচনায় সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে অকৃত্রিম ও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারা সমাজতন্ত্রের যথার্থতা উপলব্ধি করতেন এবং তা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করতেন। বলা যায় যে, এর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশে ছিল সীমাহীন।

সমাজতন্ত্রের সংরক্ষণ :

শ্রীলঙ্কার মতো অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদে পৌঁছানো সম্ভব ছিল। সব ধরনের সংকটে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একমাত্র আশাপ্রদ সহায়ক রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীকে দুটো শক্তিশালী শিবিরে বিভক্ত করে, নিজে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামো বিনির্মাণে ১৯৬০ সন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন ও সহযোগিতা করে। ভিয়েতনাম বিপ্লবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান ছিল অনুপ্রেরণার বিষয়। বিপ্লবোত্তর কিউবাকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কবল থেকে রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান কারও অজানা নয়। আমরা বলতে পারি, যে সকল দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে তাদের শক্তিশালী রক্ষাকবচ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তদুপরি এক পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীশক্তিকে সহায়তা করা বন্ধ করে দেয়। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমনটি হয়েছে। তবু স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, বামপন্থিরা যে কোন বিপদ-আপদে সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ধরনের সহায়তা পেয়েছে।

দেশে দেশে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন :

উপনিবেশিক দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ ও নব্যউপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, উপনিবেশিক রাষ্ট্রে জাতীয় মুক্তির লড়াই সংঘটিত করা। বিজয় অর্জনে নির্দেশনা প্রদান করা।

উপনিবেশ বিরোধী ধনবাদী নেতৃত্ব ও সরকারকে আপাততভাবে প্রগতিশীল হিসাবে গণ্য করা হয়। সর্বোপরি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বন্ধু হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমিকা রাখে। সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশরের নেতা নাসেরকে সমর্থন করে।

এই ঘটনা থেকে সমগ্র পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সাহসী হয়ে ওঠে। আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্ষুন্ন থাকত তা হলে ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে নিপীড়ন করা সম্ভব হতো না।

শ্রীলঙ্কায় শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭০ সালের পর যখন বিদেশি কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করে তখন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকরা প্রচণ্ড বিরোধিতা ও সংঘর্ষ শুরু করে। তখন শ্রীলঙ্কার জনগণ জাতীয়করণের পক্ষাবলম্বন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্দরনায়েককে সমর্থন দেয়। আমরা সংগ্রাম করবো, কখনও সাম্রাজ্যবাদকে মেনে নিব না–এমন একটি মন্ত্র শ্রীলঙ্কার জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পেয়েছিল।

বস্তুগত সহায়তা :

সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্তুগত সহায়তা প্রদান করেছে, এতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা সত্য যে, এই সহায়তায় সোভিয়েতের মেহনতি মানুষের সৃষ্ট বস্তুগত সম্পদ ব্যবহার করা হয়। এ ধারা এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে ঔপনিবেশিক ধারা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সোভিয়েত সহায়তা উচ্ছ্বসিতভাবে বর্ণনা করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নীতিমালা উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নিঃশর্ত বন্ধুত্বের প্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও বন্ধুত্বের নামে এই ধরনের সহায়তা দিয়েছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বাজার বিস্তৃত করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকে মুক্ত হওয়া রাষ্ট্রগুলোকে কারখানা স্থাপন, যন্ত্রপাতি নির্মাণে সহায়তা প্রদান করে। ফলে তাদের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিস্তার সাধন, কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় প্রাপ্তি নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশনায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনেক দেশ আশির দশকে শ্রীলঙ্কাকে প্রশংসনীয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে। শ্রীলঙ্কায় ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে'র নেতৃত্বে এসএলএফপি দ্বারা এই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। সোভিয়েত অনুসারী শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি Trotaskyite Lanka Samasanajy Party শ্রীমাভো বান্দরনায়েকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরীক হয়। সমাজতান্ত্রিক সরকার হিসাবে নামকরণ হলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীমাভো বন্দেরনায়েকের সরকার ছিল সংস্কারবাদী ধনতান্ত্রিক। কিন্তু শ্রীলঙ্কান কমিউনিস্ট পার্টির অংশীদারিত্ব থাকার কারণে শ্রীমাভো'র সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে। শ্রীলঙ্কায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় তারা ভূমিকা রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজস্ব অর্থায়নে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করে দেয়। তাদের অনুদানে কর্মীদের আবাসিক ব্যবস্থা ও কমিউনিটিকেন্দ্র শিল্প এলাকা স্থাপিত হয়।

সোভিয়েত অনুদানে শ্রীলঙ্কায় রাবার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলো উপহার বা দান হিসাবে প্লাইউড, টেক্সটাইল এবং চিনি কারখানা করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বের ফলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলো নিজস্ব অর্থায়নে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে শিল্পায়নে ব্যাপক সহায়তা করেছিল।

১৯৭৫ সালে শ্রীলঙ্কার পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ধনতান্ত্রিক সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানার নীতি গ্রহণ করে। তারা শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়। এর ফলে সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণির অনুদানে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার সুফল শ্রীলঙ্কার জনগণ ভোগ করতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক সরকারের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহযোগিতা এসেছিল ওই সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কারণে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই কর্মধারাকে আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়; যদিও কারও কারও বিশ্লেষণে এই ধারাকে আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসাবে গণ্যকরা ঠিক না। এই বিষয়টা আলোচনা হওয়া উচিত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছে তার যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। শ্রীলঙ্কার পুঁজিবাদী সরকার সোভিয়েত অনুদানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলো বিক্রি করলো (এমনকি শ্রীলঙ্কান ফ্রিডম পার্টি পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কোন প্রকার কৃতজ্ঞাবোধ প্রকাশ করেনি।) তারা ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রি করেই ক্ষান্ত হয়নি উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের সাথে নতুন করে গাঁটছড়া বেঁধেছে।

দুনিয়াব্যাপী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রচার সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর প্রণীত পুস্তিকাসমূহের অনুবাদ স্বল্পমূল্যে বিতরণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। এই বইগুলো জনগণের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করেছে। বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত মাসিক 'সোভিয়েত ল্যান্ড' সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। এই পত্রিকা আমাদের দেশে বাম আন্দোলনে উদ্দীপনা জাগিয়েছে। রাশিয়ায় প্যাট্রিক লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিকে 'ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি' নামকরণ করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার অধিকার বঞ্চিত ছাত্রদের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ফ্রেন্ডশীপ ইউনিভার্সিটি প্রদান করত। ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত শিক্ষা নিজ দেশে প্রয়োগ করেছে শিক্ষার্থীরা।

১৯৬৫ সালে শ্রীলঙ্কায় জনতা ভিমুক্তি প্যারামুনা–জেভিপি গঠন করেন কমরেড রোহান । তিনি ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি মার্কসীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার শিক্ষা শ্রীলঙ্কায় সত্যিকারের বিপ্লবের জন্য জেভিপি গঠনে অনুপ্রেরণা দান করে। তিনি সোভিয়েত সমাজের কল্যাণকর গঠনমূলক বিষয়গুলো এবং দুর্বলতাগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। শ্রীলঙ্কায় বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য তার জ্ঞান-শিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ অনেক সহায়ক ছিল। ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী সমাজতন্ত্রী হয়নি। অনেকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করেছে। তারা বিনামূল্যে সেখানে লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ। বিনামূল্যে শিক্ষা এবং মার্কসবাদের অনুশীলন প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের তত্ত্বগত ও আদর্শগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আমরা সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর আমাদের দেশ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। তারা বিপ্লবী আন্দোলন এবং লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করছে।

রাশিয়াসহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষ অক্টোবর বিপ্লবের অবদান উপলব্ধি করে সমগ্র পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জয়লাভ করবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কমরেড সাইফুল হক : অক্টোবর বিপ্লব মানবজাতিকে কী দিয়েছে? এই বিপ্লব শুধুমাত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্ত করেনি, পিছিয়ে পড়া সমস্ত জনগোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা নির্বিশেষে সবাইকে মুক্ত করেছে। আমাদের দেশে মার্কস-এঙ্গেলসকে অনেকে অপরিবর্তনীয়ভাবে ধর্মবিশ্বাসের মতো গ্রহণ করেছেন। লেনিন এবং তার সহযোদ্ধারা এটাকে অন্ধ অনুকরণ ও আপ্তবাক্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। তারা এর সৃজনশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন বলে রুশ দেশে বিপ্লব করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন ও ১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টা না হলে, ১৯১৭ সালে বিপ্লব করা সম্ভব হতো না। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রুশ দেশে আওয়াজ উঠেছিল, শান্তি চাই, রুটি চাই, জমি চাই। এই আকুতিকে ধরে সেখানে বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল। বিপ্লবের কর্মসূচি, রণনীতি-

রণকৌশল, তাঁরা কীভাবে ধারণ করছে এবং একে কীভাবে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে হয়, তার সফল প্রয়োগ সেখানে হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানও যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়–সেটাই দেখা যায় ২৪ অক্টোবর বিপ্লব হলে তা হবে তাড়াতাড়ি, ২৬ তারিখ হবে দেরি আর ২৫ তারিখ হবে সঠিক দিন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে তা দেশের মানুষের সামনে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা দরকার। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তার সংকটের কারণে আজকে যে ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করেছে, ট্রাম্প তার উদাহরণ। পুঁজিবাদ তার সংকট সমাধান করতে পারে না বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়া, ইউরোপের দেশগুলোতে মৌলবাদের উত্থান হয়।

স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে গুরুতর আদর্শগত বিচ্যুতি, নীতি-কৌশলের বিভ্রান্তি দেখা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তির সাথে ভারসাম্যহীন প্রতিযোগীতায় পাল্লা দেয়া, পার্টির মধ্যে জনবিচ্ছিন্নতা তৈরি হওয়া, আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি, বস্তুগত এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাপূরণ করবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিতরে-বাইরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, পার্টির অভ্যন্তরে সংশোধনবাদ জায়গা করে নেয়। মাও-সে তুং বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের ঐতিহাসিক কালপর্বে শ্রেণিসংগ্রাম থাকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শ্রেণিসংগ্রামের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে কারা জয়লাভ করবে; পরাজিত বুর্জোয়াশ্রেণি নাকি নবউত্থীত সর্বহারাশ্রেণি। মাও-সে তুং এই লড়াইটা শুরু করেছিল চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে; যদিও সেটা নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে। রুশ বিপ্লবের পশ্চাদপসারণ থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা নেয়ার ব্যাপার আছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এখন বিশ্বব্যাপী তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে–নানা ঘটনায় তা প্রমাণিত। হুবহু কপি করে পৃথিবীর কোথায়ও বিপ্লব হয়নি। আমাদের দেশেও বিপ্লবের অপরিহার্য শর্তগুলো যথাযথ অনুধাবন করে বিপ্লবী কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। এখানে নতুন তত্ত্ব নির্মাণ করতে হবে। রণনীতি-রণকৌশল-কর্মসূচি ঠিক করে এগুতে হবে। বাংলাদেশের বামপন্থার দলগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে, শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্তি, দোলাচল ও মোহগ্রস্ততা। এটা শ্রেণি সহযোগিতার নীতি, বিপ্লবের নীতি নয়। আমাদের দেশসহ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এর জন্য তারা নানা সুচতুর কৌশল অবলম্বন করছে, বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে। বামপন্থিদের কর্তব্য হবে দেশের সকল অংশের, সকল শ্রেণিপেশার, ধর্ম-বর্ণের জনগণকে এই বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করে, গণঐক্য গড়ে তুলে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নেয়া।

আমাদের দেশের শাসকশ্রেণির কোন অংশের মধ্যে জনগণের ভবিষ্যৎ নেই। আগামী এক বছরের মাথায় আমাদের দেশে যে নির্বাচন হবে, সেখানে আমাদের কী ভূমিকা হবে, সেটা ঠিক করতে হবে। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী না হয়ে, লড়াইয়ে থাকা, জনগণের চাওয়াকে মূল্য দিয়ে ভূমিকা রাখা।

এখানে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার একটা ঐক্য আছে, এর বাইরে যারা আছে প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এদের ঐক্যের প্রয়োজন হবে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী ও ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ পূর্ণ হবে। আমরা গ্রাম শহরের মেহনতি মানুষকে জাগিয়ে তুলে লাল পতাকাকে উড্ডীন করবো, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হব। সেখানে আমাদের সাথে ভারত-শ্রীলঙ্কা-নেপাল-পাকিস্তানের বামপন্থি শক্তির ঐক্য বাড়াতে হবে।

বর্নালী মুখার্জী : আমাদের দেশে ভারতবর্ষে একজন নায়ক আছে, নাম মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বাঙালি–পশুপ্রেমি। তার নাকি ৯টা কুকুর আছে।

প্রত্যেকটা কুকুরের জন্য আছে একটি করে এয়ারকন্ডিশন ঘর। আমাদের পুঁজিপতিরা অর্থনীতির সংকট সমাধানের কেমন ফর্মুলা বের করলেন দেখেন। সেটা হচ্ছে মিঠুন চক্রবর্তীর যদি ৯টা কুকুরের জায়গায় ৯০টা কুকুর থাকতো, অর্থাৎ তিনি যদি আরও বড় লোক হতেন, তা হলে প্রতিটা কুকুরের প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কারের জন্য ভারতবর্ষের বন্ধ কলকারখানার বেকার শ্রমিকরা সেখানে কাজ পেত। মাসে দুই হাজার টাকা মাইনা, তার ফেলে দেওয়া পুরান জামা-কাপড় শ্রমিকরা পরতে পারতো এবং ৯টা এয়ারকন্ডিশনের পরিবর্তে ৯০টা এয়ারকন্ডিশন বিক্রি হতো। এই যে সাদামাটা ভাষায় উন্নয়নের যে পরিকল্পনা, একেই তারা বলে থাকে বিশ্বায়ন, ভালো ভাষায় বললে চুঁইয়েপড়া অর্থনীতি এর মধ্যদিয়েই নাকি সমস্যার সমাধান হবে।

বিশ্বায়ন–পুঁজিবাদ–সাম্রাজ্যবাদ খারাপ, এই কারণে এটা ধ্বংস হবে, কমরেড লেনিনের শিক্ষা এটা নয়। রুশ বিপ্লবের ও কমরেড লেনিনের শিক্ষা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলো দুর্বল হয়, তা যদি অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার না হয়, সেখানে যদি আঘাত না করা যায়, তা হলে তা যতই খারাপ হোক তাকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আর এটা আজকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা জানে বলে তারা দুটো কথা আমাদের সামনে বারবার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন; পেপসি ও কোকাকোলার মধ্যে ভাব ভালোবাসা যথেষ্ট শক্তিশালী, তারা বোঝাপড়া করে চলেন, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ঐক্যের জায়গাটাই বেশি। আরেকটা হলো, কোন একটি দেশে পুঁজিবাদকে বেধে ফেলা যাচ্ছে না, তাই একটি দেশে সমাজতন্ত্র করে কিছুই হবে না। কিন্তু তাদের এই কথা যে সত্য নয়, তা রাশিয়ায় প্রমাণিত। তারা যেটাকে বলে বাজার অর্থনীতি সেটা আসলে যুদ্ধ অর্থনীতি।

প্রত্যেকটা দেশের মৃতপ্রায় পুঁজিবাদকে দাঁড় করাতে সরকারকে ঋণ করতে হচ্ছে এবং সরকারের ওপর দাঁড়িয়ে কখনও সংস্কার কখনও যুদ্ধ করে আজকে তারা বেঁচে আছে। আমাদের দুইটি প্রশ্নকে বার বার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। প্রথমত, আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, তারা শক্তিশালী না দুর্বল, তাদের মধ্যে কী ঐক্য প্রধান না অনৈক্য প্রধান। গোটা রুশ বিপ্লবের পর্যায়ে কমরেড লেনিনকে বার বার একথা প্রমাণ করতে হয়েছে। রুশ দেশে জারতন্ত্রকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উচ্ছেদের জন্য নারদনিকরা যখন সংগ্রাম করছিলেন, সে সময় গোটা ইউরোপ জুড়ে যারা মার্কসবাদী তাদের মধ্যে হতাশা, তারা মার্কসবাদকে দেখছে শুধু চর্চার বিষয় হিসেবে। ক্ষমতা দখলের বিষয় হিসাবে নয়। লেনিন নারদনিকদের বললেন, জারতন্ত্রকে এই মুহূর্তের উচ্ছেদ করা যাবে, এবং শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে, কারণ রাশিয়ায় তখন পুঁজিবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণির একটা স্তর পর্যন্ত বিকাশ ঘটেছে। লেনিন ১৯০৩ সালে বলছেন, এই মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব, তার বন্ধুরা বলছে হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন জোটের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করছি, আমাদের দলকে তৈরি করার চেষ্টা করছি। কমরেড লেনিন তখন জোটের বিরোধিতা করেছেন; জোটের বিরোধিতার জন্য নয়। কারণ, সেই সময় রাশিয়ায় অল্প কয়েকজন মাত্র মানুষ বিশ্বাস করতো যে, রাশিয়ায় জারকে উচ্ছেদ করা সম্ভব। এই কথা রাশিয়ার জনগণও মনে করে না, তার বন্ধুরাও মনে করে না। তাই আমাদের সেই দল গড়ে তুলতে হবে তাদের নিয়ে যারা মনে করে এখনই ক্ষমতা দখল সম্ভব। তিনি মতাদর্শগতভাবে তার চিন্তা প্রতিষ্ঠা করলেন। তার দুই বছর পর তিনি বাস্তব রাজনীতিতে পদার্পন করছেন। তখন তিনি নিজেও শিখলেন এবং গোটা দুনিয়াকে শিখালেন যে, কীভাবে শত্রুর অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে হয়। এর ওপর নির্ভর করবে আমি কতটা বিপ্লবী আর কতটা বিপ্লবী নয়। তার সামনে সুযোগ আসলো ১৯০৫ সালে যুদ্ধের বছর, তখন জাপ সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ চলছে, চীনের একটা অংশকে দখল করাকে কেন্দ্র করে। আমরা জানি যুদ্ধে যে পক্ষ হারবে তাদের বিক্ষোভ আর বিক্ষোভে থাকবে না, সেটা বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থানের জন্ম নিবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে তাই সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবে রূপ দেয়া যায়নি। লেনিন, তিন বছর আগে বলেছিলেন কারও সঙ্গে জোট নয়। পরবর্তীতে বললেন, রাশিয়ায় সংসদীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য নয়, জারতন্ত্র যদি হটে যায়, আমরা বুর্জোয়াদের সঙ্গেও কোয়ালিশন করব, সরকারে যাব, প্রয়োজনে আমরা বিরোধী পক্ষ হব।

ঐসময় তৃতীয় আজন্তর্জাতিকের কমরেডদের বলছেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ খুব শক্তিশালী, মনে হয় কয়েক বছরের মধ্যে ওরা যুদ্ধ বাধাবে। যুদ্ধ বেধে গেলে তোমরা নিজ দেশের সরকারকে সমর্থন করো না। সবাই তখন তাতে রাজি হয়ে গেল। যুদ্ধ বেধে গেলে লেনিনের শিক্ষক কাউৎস্কি বললেন সাম্রাজ্যবাদ অনেক শক্তিশালী তাকে এখন ফেলা যাবে না। অতএব সবাই ট্রেড ইউনিয়ন কর, শ্রমিকদের শ্রমিকের কাজের চাপ কমার দখল চলবে না। লেনিন গিয়ে বলছেন, আমরা জারের এই লোকটা হচ্ছে জার্মানির প্রতিপক্ষ হচ্ছে জার্মান। যদি জার্মানির একটা সুবিধা হতে যদি জার সাম্রাজ্য হেরে যায়, যাবে–তখন আমরা ক্ষমতা জার পড়ে গেল, বুর্জোয়ারা হলো, তারা মাত্র ক্ষমতায় না। ওই সময়ে প্রত্যেকটা সংখ্যা লঘু। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদ্রোহ করলো কেরেনেস্কির হবে না। বলশেভিকরা ওই কেরেনেস্কি সরকারকে রক্ষা করলো, কর্নিলভদের অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করলো। এর মধ্যে দিয়ে গোটা রুশ দেশের জনগণের সামনে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, কেরেনস্কি নয়, যদি কেউ শক্তিমান শাসক হতে পারে তিনি হলেন কমরেড লেনিন। কারণ তত দিনে সমস্ত সোভিয়েতে বলশেভিকরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে গেল। এই রকম পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে ফেললো। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বরের আগের বিশ্বপরিস্থিতি আর পরের পরিস্থিতি ভিন্ন। চলছে যুদ্ধ অর্থনীতি কিন্তু পরিস্থিতি জটিল। শ্রমিকরা মন্ত্রীকে আটকে ফেলেছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা বিদ্রোহ করছে। সীমান্তগুলো সাম্রাজ্যবাদের দখলে। কমরেড লেনিনের আকুতি এই মুহূর্তে ইউরোপ জুড়ে বিপ্লব হয়ে যাক। ইউরোপের অবস্থা তখন টালমাটাল। ধীরে ধীরে কমরেড লেনিন পরিস্থিতি নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা, অর্জন ও প্রাসঙ্গিতা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমরেড খালেকুজ্জামান

পুঁজিবাদীরা তখন দেখলো, তাদের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তখন তাদেরও জনগণের কিছু কল্যাণের কথা ভাবতে হবে। এছাড়া তার বাঁচার কোন পথ নেই। তার বাজার নেই, অর্থনীতি নেই আছে শুধুমাত্র রাজনীতি।

বাংলাদেশেও এখন বিপ্লবের পরিস্থিতি বিদ্যমান। বিরোধীদের দ্বন্দ্বকে এখন কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন একটা বড় ঐক্য। এই ঐক্যের উদ্দেশ্য সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা নয়। বাংলাদেশের আকাশে লাল ঝান্ডার উত্তোলন।

ডা. প্রসাদ : অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে বাসদ গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করেছে তার জন্য বাসদ নেতৃত্বকে অভিনন্দন। আশা করি

এই ধরনের বড় আয়োজন ভবিষ্যতেও ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নে এই ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অক্টোবর বিপ্লব শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেরই অর্জন নয়, এ শিক্ষা সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ধারণকারী সর্বহারাশ্রেণির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে বলা যায় যে, অক্টোবর বিপ্লবের ৭০ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে বিপর্যয় হলো, তার কারণ চিহ্নিত করা এবং তা উত্তরণের পথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করাই অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষের শিক্ষা। অক্টোবর বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণির–নারীর অধিকার এবং জীবনব্যবস্থার উন্নত ধারণার সাথে বিশ্বকে পরিচিত করিয়েছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো, যারা নিজেদের আধুনিক উন্নত রাষ্ট্র বলে দাবি করে, তারাও নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের পরে। এই বিপ্লব থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর জনগণ মুক্তির সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছিল।

কিছু মানুষ দাবি করে অক্টোবর বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক তা নয়, রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে কিন্তু সমাজতন্ত্রের আদর্শের বিপর্যয় ঘটেনি। বিষয়টা এমন নয় যে, ওই সকল দেশের জনগণ ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছে। এর জন্য দায়ী ওই সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোতে প্রতিবিপ্লবী ও সংশোধনবাদী শক্তির নেতৃত্বে আসা। স্তালিন পরবর্তীতে ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদের সূচনা করে, আর সংশোধনবাদী গর্বাচভ তার গ্লাসনস্ত ও প্রেরস্ত্রয়ীকার মধ্য দিয়ে প্রতিবিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করে। প্রশ্ন আসে, প্রতিবিপ্লবী নেতৃত্ব কীভাবে পার্টিতে আসলো? পার্টির অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে আদর্শগত সংগ্রামের ঘাটতির কারণসহ বহুবিধ কারণে প্রতিবিপ্লবী শক্তি নেতৃত্বে আসতে পেরেছিল।

এটা একদিনে শুরু হয়নি, বিংশতিতম কংগ্রেস থেকেই শোধনবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয়। শোধনবাদী নেতৃত্ব পার্টির স্তরে স্তরে তাদের পছন্দমতো লোককে বসায় এবং সত্যিকারের কমিউনিস্টদের সরিয়ে দেয়। আদর্শগত চর্চার অভাবে চেতনার মানের ক্রমাবনতি হতে থাকে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর যারা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়, পরে তাদের অনেকে পার্টি নেতৃত্বে আসে।

মার্কসবাদের শিক্ষা ছিল, জার্মানসহ ইউরোপের উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে। কিন্তু মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটিয়ে লেনিন পিছিয়ে পড়া ধনতান্ত্রিক রাশিয়ায় যে বিপ্লব সম্পন্ন করেন, তার পিছনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আজকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে অভিজ্ঞতা বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাসদের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।